লৌকিক উপাদান : 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'-এ

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী

সাহিত্যে লোকসংস্কৃতির ছাপ থাকবে-- এটা প্রায় ধ্রুব সত্য। আবার এরকমটা হওয়াও একভাবে অসম্ভব নয় যে প্রাচীন সাহিত্যেরই বিশেষ কোন' বর্ণনীয় বিষয়, বাক্য বা বাক্যাংশ পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতিতে আত্মভূত হয়ে পড়েছে। 'মিথ' হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিষয়। কালের ব্যবধান যদি বেশি হয়, সে-রকমটা হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আজ থেকে দু-হাজার বা ততোধিক বছরের প্রাচীন কোন গ্রন্থে (আলোচ্য ক্ষেত্রে কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'); লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা তাই যথেষ্ট সাবধানতার অবকাশ রাখে।

সংস্কৃত নাটকের 'প্রস্তাবনা'র ভিতরেই, আমার ধারণা, লোকসংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যাবে। যেন চন্ডীমন্ডপে সবাই জড়ো হয়েছে, একটু ঢিলেঢালা ভাব, হচ্ছে-হবে এইরকম পরিবেশ। তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হল-- এইরে, আর দেরী করলেতো রাত ভোর হয়ে যাবে। অতঃপর শুরু-- 'এই যে বাবু মশায়েরা! শুনুন' .... ইত্যাদি। কোর্ট-কালচার বলতে যা বুঝি এ তা নয়। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' দেখুন। সূত্রধার হাঁক পাড়লেন-- 'এই যে গিন্নী, সাজগোজ হল? ভাবখানা এই-- 'তোমাদেরতো আবার সাজতে আড়াই ঘন্টা! আর কতক্ষণ? আমাকে দেখেও তো শিখতে পারো! টেরি কেটে, পাট ধুতি পরে, বাবুটি হয়ে বসে আছি ঘন্টাখানেক হল।' --এইরকম পরিবেশ এবং বাচনভঙ্গী এবং অতঃপর সূত্রধার-পত্নীর প্রশ্ন-- 'এবার তাহলে কী করি' এবং তার উত্তরে সূত্রধার' একটা জমিয়ে গান হোক্-- এসবই 'লোক-কালচার' ('ফোক' কালচার)-এর ছবি তুলে ধরে। গানের বিষয়টাও দেখুন। মেয়েরা কানে শিরীষ ফুল গুঁজছে।[১] এটা কোন' 'কোর্ট কালচার' থেকে আসেনি। বর্ণনার ভেতরেই গ্রাম্য সোঁদা গন্ধ-- অঙ্গীকারের উপায় নেই। গান তো হল। সূত্রধার (গ্রাম্য মোড়ল গোছের লোক? কি ঝিমুচ্ছিলেন? গরমের দিন, বিকেলবেলায় ফুরফুরে হাওয়া। ঝিমুনির দোষ কী?[২] তা নাহলে তিনি বলবেন কেন-- হ্যাঁ, আজ কোন্ নাটক করব গো'? এক মিনিট আগে বলা কথা তিনি ভূলে যাবেন কেন? কালিদাস অবশ্য 'গীতরাগ'-এর আকর্ষণের কথা বলেছেন। তা তিনি বলুন।

রাজা মঞ্চে এলেন হরিণকে তাড়া করতে করতে। ঋষিরা বারণ করলেন। রাজা ধনু নামালেন। সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদ-- 'তোমার একটা ছেলে হোক, যে সে ছেলে নয়-- রাজার বেটা রাজা-ছেলে'।[৩] এ-রকমটা হবার কথা নয়। 'যশস্বী হোন' 'দীর্ঘয়ু হোন'-- এইরকম আশীর্বাদে বিক্ষত রাজা। রূপকথার গল্পের পটভূমি না থাকলে এরকম আশীর্বাদ হয় না। এ যেন সেই গল্প-- এক রাজা ছিল, ঘরে ঘরে রাণী, ক্ষেত ভরা ধান, রাজকোষ মোহর-জহরত হীরেতে ঠাসাঠাসি। তবু রাজার মনে সুখ নেই। কেননা, তাঁর কোন ছেলে নেই। শেষকালে রাজা এলেন তপোবনে। ঋষি আশীর্বাদ দিলেন-- 'তোমার পুত্র হবে' ইত্যাদি। সতরাং আমরা অনায়াসেই দুষ্যন্তের আশীর্বাদ--প্রাপ্তির পটভূটিতে লোকবিশ্বাসকে, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লোকপ্রচলিত গল্পকে দেখতে পারি। আরো বলি-- ঋষিরা রাজাকে 'যশস্বী হোন', 'দীর্ঘায়ু হোন' ইত্যাদি না বলে হঠাৎই পুত্র প্রপ্তির আশীর্বাদ করতে গেলেন কেন? এমন তো হতে পারত, রাজার দশ-বিশটি সন্তান ঘর আলো করে আছে-- সেক্ষেত্রে ঐ আশীর্বাদের কোন মূল্যই থাকতো না। এমতাবস্থায় আমাদের ধরতেই হবে রাজার অপুত্রক থাকাটা এবং তার জন্য রাজার মনোব্যথার কথাটা রাজ্যে মুখে মুখে ফিরতো। সুতরাং রূপকথার সঙ্গে তা পুরো মিলে যায়।

শকুন্তলার সঙ্গে রাজার দেখা হল। দেখামাত্রই ভালোবাসা। অতঃপর রাজার কাছে-- 'কাম আমায় পোড়াচ্ছে' এই ধরণের প্রণয়পত্র পাঠানো[৪]-- সবই যেন রূপকথার পক্ষিরাজের গতিতে দ্রুত এগোচ্ছে। 'ক্লাসিকাল টাচ্' এতে বিশেষ নেই। বিয়ের আগেই দুষ্যন্তকে দিয়ে কথা আদায় করিয়ে নেওয়া (হোক না তা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মাধ্যমে) যে তাকেই রাজরাণী করা হবে এবং তার ছেলেকেই পরবর্তী রাজা মনোনীত করা হবে[৫]-- তাও যুগযুগান্ত প্রচলিত গল্পগাথার কথাই মনে করিয়ে দেয়। ক্লাসিকাল বর্ণনার বিলাস এখানেও নেই।

শরীরের বিশেষ অঙ্গের স্পন্দন, বিশেষ বিষয় অবলোকন প্রভৃতি ভবিষ্যৎ শুভাশুভের জ্ঞাপক–– এই লোকবিশ্বাসের বেশ কিছু নমুনা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে ছড়িয়ে আছে। আশ্রমে রাজা ঢুকছেন; এমন সময় তাঁর দক্ষিণ বাহুতে স্পন্দন। রাজা বললেন–– এটা কী করে সম্ভব। আশ্রমে বরস্ত্রীলাভ কী ভাবে হতে পারে? ('শান্তমিদমাশ্রমেপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।')[৬] প্রশ্ন উঠতে পারে –– রাজারতো সম্ভাবনা নেই–– বললেন; তাহলে বিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে কোথা থেকে? না তা নয়। রাজা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন 'এখানে' অর্থাৎ 'এই তপোবনে' সুন্দরী জুটবে কোথা থেকে? জায়গা সম্বন্ধে সন্দেহ বা বিস্ময়[৭]; দক্ষিণবাহু স্পন্দন থেকে সুন্দরী লাভ হবে কি হবে না–– এই বিষয়ে নয়। দৃঢ়মূল সংস্কার, লোকবিশ্বাস–– এসবের জন্ম দেয়। পঞ্চম অঙ্কেও শকুন্তলার–– (নিমিত্তং সূচয়িতা) 'অম্মহে, কিং মে বামেদরং ণঅনং বিপ্ফুরদি?' (অহো, কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি?)[৮] 'আমার ডান চোখ কাঁপছে কেন?'–– এই বেল ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় শঙ্কিত হওয়ার ছবি আছে। সপ্তম অঙ্কেও রাজা দুষ্যন্ত তাঁর বাহুস্পন্দনে ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা পোষণ করেছেন–– যদিও ততটা সৌভাগ্য তাঁর জীবনে আবার ঘটবে–– একথা তাঁর বিশ্বাস হতে চাইছিল না। 'রাজা (নিমিত্তং সূচয়িত্বা)–– 'মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা। পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ততে।।'[৯] (দক্ষিণ বাহুতে স্পন্দন অনুভব করে ভাবী মঙ্গলের ইঙ্গিত লক্ষ করে) আমি আমার অভিলাষ পূরণের কোন আশা আর পোষণ করি না। সুতরাং হে বাহু, তুমি অকারণে স্পন্দিত হচ্ছ। ....' ইত্যাদি। রাজা দুষ্যন্ত বা শকুন্তলা নিমিত্তে (শুভাশুভ লক্ষণে) বিশ্বাস করেছেন–– শুধুমাত্র এটুকু বলেই মহাকবি কালিদাস ক্ষান্ত হননি। কালিদাস ঐসব নিমিত্তকে ভাবী শুভাশুভে পরিণত করিয়ে তবে বিশ্রাম নিয়েছেন। তার ফলে এই নাটকে লোকবিশ্বাসের বণনাই নয়, তার অংশীদার যে স্বয়ং কবিও (কেবল তাঁর কল্পিত চরিত্ররাই নয়)–– তারও প্রমাণ মিলছে। এই জিনিসটাই বিশেষ করে লক্ষণীয়। রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হল–– অথচ শকুন্তলা মিলল না কিংবা শকুন্তলার ডান চোখ কাঁপল–– অথচ রাজা তাকে সাদরে বরণ করলেন, এরকমটা ঘটলে লোকসংস্কারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও দৃঢ়মূল ভিত্তি থাকতো না সবকটিকে সবার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে কালিদাস লোকসংস্কারকে প্রায় কার্যকারণ সম্পর্কে রূপায়িত করে দিলেন। বর্তমান লেখকের ধারণা–– ক্লাসিকাল সাহিত্য এইভাবেই অনেক ক্ষেত্রে লোকসংস্কারকে বা বীজকারে স্থিত লোকবিশ্বাসকে, সার্বজনীন এবং সর্বকালীন প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করে। কবিরা লোকসংস্কারের আশ্রয় করেন, আবার কবির কাব্যে লোকসংস্কার আশ্রয় দেয়। এ যেন পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ। যে পুত্র বাল্যে পিতার কোলে স্নেহ পায়, পিতার বার্ধক্যে সে-ই আবার পিতার আশ্রয় হয়।

এবারে আসি অন্য প্রসঙ্গে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে তরুলতার নামকরণগুলি লক্ষ্য করলেও এর ভিতরে লোকসংস্কৃতির ছাপ মিলবে। গাছের নাম 'বনজ্যোৎস্না'।[১০] কিংবা, কোন এক সহকার বৃক্ষকে লতায় বেষ্টিত অবস্থায় দেখে এবং শকুন্তলাকে বারবার তার দিকে তাকাতে দেখে সখীদের মন্তব্য–– 'শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নার মত সুন্দর বর চায়' ('জহ বণজোসিণী অনুরূবেণ পাঅবেণ সংগদা অবি ণাম এব্বং অহং বি অত্তণো অণুরূবং বরং লহেঅং ত্তি।')[১১] ––এগুলি অবশ্যই গাছের সঙ্গে মানুষের আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার (যা 'লোক-কালচার'[১২]-এর অন্যতম বহিঃপ্রকাশ) পরিচায়ক। প্রথম অঙ্কেই, উল্লিখিত অংশের একটু আগেই দেখছি প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলছে–– 'হল সউন্দলে, এথ এব্ব দাব মুহূত্তঅং চিট্ঠ। জাব তুএ উবগদাএ লদাসণাহো বিঅ অঅং কেসররূক্খও পডিভাদি।'[১৩] (এই যে শকুন্তলা, তুই একটুখানি ঐখানে দাঁড়া। বকুল গাছটার পাশে তুই দাঁড়ালে মনে হয় গাছটা তার প্রেয়সী লতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে)–– এইসব কথাবার্তায় তো আগেকার দিনের গাছের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার স্মৃতি ভেসে ওঠে। নাগর সভ্যতায় এ ধরণের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা (শহুরে লোকেরা অনেক সময় যাকে 'আদেখলেপনা' বলে থাকেন) থাকে না।

শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তকে পেতে চায়–– একথাটা রাজাকে জানতে হবে। কীভাবে জানানো যায়? সখীরা বুদ্ধি জোগায়–– শকুন্তলা একখানা প্রেমপত্র লিখে দিলে তারা তা দেবতার প্রসাদের ছলে রাজার হাতে পৌঁছে দেবে। সেই সিদ্ধান্তই গৃহীত হল। তা শকুন্তলা লিখবে কি দিয়ে? কিসের উপর লিখবে? 'ণ ক্খু সন্নিহিদাণি উণ লেহনসাহণাদি।'[১৪] প্রিয়ংবদা বলে–– 'ইমস্সিং সুওদরসুউমারে ণলিনীপত্তেনহেহিং ণিক্খিত্তবণ্ণং করেছি।'[১৫] (এতস্মিন্ শুকোদরসুকুমারে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্তবর্ণং কুরু।) ––'শুকপাখির পেটের মত কোমল এই পদ্মপাতায় নখ দিয়ে অক্ষরগুলো

বসাও।' কোমলতা বা মৃদুতার (softness) উপমা দিতে শহুরে কবিদের বলুন : উত্তর আসবে–– 'মাখনের মত নরম', 'সিল্কের কাপড়ের মত নরম', 'স্পঞ্জের মত মৃদু' কিংবা বেশি হ'লে বিড়ালের মত নরম'। শুকপাখির পেটের তলার দিকে যে পালকগুলো থাকে, সেগুলো সব চাইতে কোমল। তার সঙ্গে পদ্মপাতার মৃদুতার উপমা তারাই বলে থাকে, যাদের হাতে শুকপাখি এসে বসে, সেই শুকপাখির কোমল স্পর্শের অনুভূতি যাদের আছে সেই লোকই এরকম উপমা দেবে। এরকম উদাহরণ আরো বহু আছে। প্রেমপত্র গোপনে পাঠানোর কায়দাতেও লোককাহিনীর ছায়া অবশ্যই চোখে পড়বে।

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকে ভূত-প্রেত-রাক্ষসের উপদ্রব বারংবার এসেছে। লোকবিশ্বাসের, লোক-সংস্কৃতির অন্যতম পরিচয় বহন করে ঐসব কাহিনী। তৃতীয় অঙ্কের শেষদিকে আমরা দেখছি আকাশবাণীতে ধ্বনিত হচ্ছে–– 'সায়ন্তনে সবনকর্মণি সংপ্রবৃত্তে/বোদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রযস্তাঃ। ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ/সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম্ ।।'[১৬] (সন্ধ্যাবেলার যজ্ঞ শুরু হতেই হোমাগ্নি জ্বলছে এবং যজ্ঞবেদির চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে ভয়-জাগানো সন্ধ্যাকালের মেঘের মত পিঙ্গলবর্ণ রাক্ষসদের ছায়া নানাভাবে বিচরণ করছে।)–– এতো একেবারে রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনী ক্লাসিকাল নাটকে ঢুকল। রাজা দুষ্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ধনু হাতে তাদের বধ করতে ছুটলেন। রূপকথা আর রূপকথা–– রঙে-ঢঙে, বর্ণে-গন্ধে। আর একটা উদারহণ : রাজা দুষ্যন্ত অপুত্রক। বংশলোপ পাচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পর পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধান্ন কে দেবে–– এই চিন্তায় তিনি আকুল। তিনি প্রত্যক্ষ দেখছেন, তাঁর দেওয়া পিন্ডজল তাঁর পিতৃপুরুষেরা গ্রহণ করার আগে ভবিষ্যতে আর তাঁরা এসব পাবেন না ভেবে দু:খে পিন্ডজল দিয়েই তাঁদের চোখ মুছে তারপর তা পান করছেন ('অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সংভৃতানি/কোনঃ কুলে নিবপনানি নিযচ্ছতীতি। নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং/ধৌতশ্রুশেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি।')[১৭] লক্ষণীয় যে, এই বিশ্বাস এমনই দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত যে, রাজা দুষ্যন্ত মূর্চ্ছা গেলেন। (বর্তমান লেখক তার সম্পাদিত আলোচ্য নাটকের এই অংশে মন্তব্য করেছেন : 'রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার জন্য অনেক কেঁদেছেন .... কিন্তু মূর্চ্ছা যাননি; মূর্চ্ছা গেলেন পিন্ডলোপের ভয়ে, শকুন্তলার দুঃখের নয়। শকুন্তলাকে হারানোর কারণে .... রাজার এই দশার বর্ণনা হলে দুষ্যন্তের প্রেমের অবনমন হত বলে মনে হয় না)[১৮]। এই ষষ্ঠ অঙ্কেই মাতলির অদৃশ্য থেকে বিদূষককে আক্রমণ করে রাজাকে উত্তেজিত করার চেষ্টায়[১৯] কিংবা সানুমতীর অদৃশ্যভাবে রাজাকে অনুসরণ করার বর্ণনায়[২০] লোকগাঁথার পরিচয় অবশ্যই মিলবে।

সপ্তম অঙ্কের আকাশপথে রথে চড়ে স্বর্গ থেকে ফেরার বর্ণনাতেও[২১] রূপকথারই প্রতিবিম্ব।

এবারে আর এক দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই নাটকের নাম 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'। অনেকেই বলে থাকেন–– অভিজ্ঞানের দ্বারা স্মৃতা শকুন্তলা=অভিজ্ঞান-শকুন্তলা। তারপর অন্যান্য ব্যাকরণের প্রক্রিয়ায় 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।' তা 'অভিজ্ঞান' কথার অর্থেতো স্মারক। দুর্বাসা কিন্তু অভিশাপের অবসান হবে স্মারক দেখালে '(অভিজ্ঞান' দেখালে) এমন কথা বলেনি (একথা কিন্তু অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়)। তিনি বলেছেন 'অভিজ্ঞান-আভরণ' দেখালে রাজার স্মৃতি উদিত হবে। ("অহিণ্ণাণাভরণ-দংসণেণ সাবো নিবত্তিস্সদি।[২২] ––অভিজ্ঞানাভরণ-দর্শনেন শাপো নিবর্ত্তিষ্যতি–– অর্থাৎ অভিজ্ঞান আভরণ বা স্মারক-অলংকার দেখালে তবে শাপমুক্তি ঘটবে)। শকুন্তলা যখন রাজার কাছে এলেন তখন স্বয়ং শকুন্তলাই 'অভিজ্ঞান'। তার প্রতিটি পদক্ষেপ রাজার পরিচিত। শুধু পদক্ষেপ কেন! শকুন্তলার পায়ের ছাপের বৈশিষ্ট্য দেখে পর্যন্ত রাজা বলে দিতে পারতেন–– ওটা শকুন্তলার চরণবিহ্ন।[২৩] সেই 'পদচিহ্নকুশলী' রাজা সাবয়ব শকুন্তলাকে দেখেও চিনতে পারবেন না, তার বলা নিভৃত বেতসকুঞ্জের গোপন প্রণয়ের সুখস্মৃতি-জড়ানো ঘটনার বর্ণনায়ও[২৪] – তাঁর স্মৃতি জাগরিত হবে না–– কেবল আভরণ আংটি দেখে তবেই রাজার স্মৃতি ফিরে আসবে[২৫]–– এই যে ঘটনাটা, এটাতো পুরোপুরি একটা রূপকথার গল্প। আরো দেখুন–– আংটি ছিল শকুন্তলার হাতে। শচীতীর্থে স্নান করতে গিয়ে সেই আংটিটাই শকুন্তলা হারালেন, অতঃপর একটা রুই মাছ সেই আংটিটাকে আহার্য ভেবে খেয়ে ফেলল, অতঃপর সেই রুই মাছ জেলের জালে ধরা পড়ল, অতঃপর জেলে সেই আংটি বাজারে বিক্রি করতে গেল, অতঃপর জেলে সেটাকে কাটলো (বাজারে নিয়ে), ––অতঃপর তা পুলিশের চোখে

পড়ল। (সোনারী অত্যন্ত দ্রুততায় পুলিশকে খবর দেওয়ায়, বুঝতে হবে)–– ইত্যাদি অসংখ্য অনিশ্চয়তার বন্ধন পেরিয়ে রাজার হাতে আংটি পৌঁছানো রূপকথা গল্পেই সম্ভব। যেখানে যুক্তিনিষ্ঠ হতে গেলে রসে বঞ্চিত হতে হবে–– পদে পদে। দুটো শামুককে একবার হ্যান্ডশেক (?) করিয়ে বিপরীতে মুখ করে ছেড়ে দেওয়া হল। তারা সারা পৃথিবী পাক দিয়ে (থাকুক না মাঝখানে সাত সমুদ্র-তেরো নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল) আবার একদিন ঠিক একই জায়গায় এসে হাত মেলাবে–– এই রকম অনিশ্চয় অবাস্তবতার সঙ্গে এই আংটি পুনরুদ্ধারের বিশেষ তফাৎ আছে বলে মনে হয় না। যা স্বাভাবিক ছিল তা হল এইরকম–– আংটি হাত থেকে পড়ল। পাঁকের উপর খানিকক্ষণ রইল। তারপর পাঁকের আরো গভীরে, ব্যস্। দুষ্যন্তের শকুন্তলা পাওয়ার আশা শেষ (কিংবা বলা ভালো, শকুন্তলার দুষ্যন্তকে পাওয়ার সম্ভাবনা শেষ।) ঠিক আছে, মাছে না হয় খেল–– ওর 'রত্নগর্ভা' হবার শখ হয়েছিল। এটাও মেনে নিলাম–– জেলের জালেই সে ধরা পড়বে (মানুষের জন্য বলিপ্রদত্ত প্রাণী তো!)। বাড়িতে এনে মাছটাকে কেটে (এমনকী বাজারে নিয়ে কাটলেও) আংটিটাকে পেয়ে সে তার মেছুনী বৌয়ের কথাই প্রথম ভাববে–– এরকমটাই ভাবা সঙ্গত। তাও হল না। জেলেটা আবার এমনই গরীব যে সেদিনই তার আংটি বেচতে হবে–– এটাও না হয় মেনে নিলুম। মেয়েরা গয়না দেখলে জীবন থাকতে তা ছাড়বে না–– এই ভয়ে জেলে হয়ত ঘরের বৌকে আংটিটা দেখানো নিরাপদ মনে করেনি। কিন্তু আংটিটা বেচতে যখন গেল, তখন দোকানি জেলেকে দেখেই বুঝতে পেরেছে ওটা জেলের আংটি নয়। এখন সে যা করবে, তা হল–– জেলেকে ভয় দেখিয়ে যত কমে পারে সেটাকে কিনবে (তবেই না ব্যবসায়ী!) এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য তৎক্ষণাৎ আগুনে গলিয়ে নেবে। এই ব্যাপারে বর্তমান লেখক একশ ভাগ নিশ্চিত আছে। দোকানি তা করল না। এই রকম 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' (কিংবা জাতক গল্পের 'সেরিবান') ব্যবসায়ী কোন যুগেই ছিল কি? (কোন কটাক্ষপাত নয়–– প্রচলিত প্রবাদ এই যে, সোনারীর লোভ এমনই যে, সে যখন নিজের আত্মীয়ের জন্যও গহনা প্রস্তুত করে, তখনও তাতে যতটা পারে বেশি খাদ মেশায়, ওজনে কম দেয়)। প্রশ্ন উঠতে পারে, জেলে সোনারীর কাছে আংটি বিক্রি করতে গেছে–– তার প্রমাণ আছে কি? উত্তর–– এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। সোনার আংটি সোনারীর কাছেই বিক্রি করতে যাবে, মুদির কাছে নয় (দোকানের সব মাল বেচলেও রাজার রত্নভাস্বর, 'লদনভান্ডলং'[২৬] আংটির দাম হবে না)–– এটাই স্বাভাবিক। যাই হোক, সোনারী ছিল 'সোনার চরিত্র', Golden Character–– এটা ধরে নিলেও পুলিশ কর্মচারীরা সেই আংটি গায়েব করে দেবে না–– এটাই বা কী রকম অন্যায় কথা! রুই মাছ আংটি না খেলেও খেতে পারে, তা'বলে পুলিশ খাবে না!! থাক এসব কথা–– যেটা প্রতিপাদ্য তা হল এই যে–– রাজার হাতে আংটি আসার ব্যাপারটা সম্পূর্ণই লোকগল্পের প্রবহমান ধারায় আগত। আর আংটি দেখা মাত্রই রাজার মনে শকুন্তলার স্মৃতি উদয়ের ব্যাপারে তুক-তাক করে 'নখদর্পণে' অতীত ঘটনা দেখার সঙ্গে কিংবা আয়নায় সময়কে পিছিয়ে নিয়ে Flash Back এ অতীতের দৃশ্য দেখার সঙ্গেই মেলে।[২৭] লোক বিশ্বাস মনের গভীরে দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে দর্শক-পাঠক-লেখক কারুরই এসব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হত না, গোটা গল্পটাই তরল শিশুপাঠ্য রূপকথা বলে মনে হত, নাটক হত না।

স্বর্গ থেকে স্বর্গীয় বিমানে ফেরার পথে মারীচের আশ্রমে নামা এবং ঠিক সেই সময়েই ভারতের সিংহ-শাবকের সঙ্গে খেলা, রাজার দেখা, ভারতের 'শকুন্ত' বা মাটির ময়ূরব চাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি সবই বেশ কিছু কল্পিত (পূর্ব নির্ধারিত–– টাইমিং সেট করা) অনিশ্চয়তার সমাহারমাত্র। ভারতের হাতের কবচ, যা মাটিতে পড়লে মা-বাবা কিংবা নিজে ছাড়া অন্য কেউ মাটি থেকে তুললে সাপ হয়ে দংশন করবে–– এই ব্যাপারটাও লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত নয় কি?[২৮]

পাদটীকা

১. তু. 'ঈসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।
ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসসুসুমাইং।'
––অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, কালিদাস বিরচিত, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা' টীকা এবং স্বরচিত 'সুষমা' ও 'অধ্যাপনা' ব্যাখ্যা সহ সম্পাদিত, পরিবর্ধিত
তৃতীয় সংস্করণ, (১৯৯৪) প্রস্তাবনাংশের চতুর্থ শ্লোক, দ্রষ্টব্য : পৃ. ২৪

২. তু. 'সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংর্গসুরভিবনবাতাঃ।

প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।।'
....তত্রৈত, শ্লোক ৩. পৃ. ২২

৩. তু. 'পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি।' তত্রৈব, প্রথম অঙ্ক, শ্লোক, ১২ গঘ, পৃ. ৪৭

৪. তু. 'মম উণ কামো দিবারি রত্তিম্মি। / নিগ্‌ঘিণ তবই বলীয়ং/
তুই বুত্তমনোরদাইং অঙ্গাইং।।' (প্রাগুক্ত), ৩/১৩ খগঘ. পৃ. ২১৬

৫. তু. 'পরিগ্রহবহুত্বে হপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্।।'–– প্রাগুক্ত, ৩/১৭. পৃ. ২২৫

৬. দ্রঃ প্রাগুক্ত, ১/১৫, পৃ. ৫৭

৭. তু. কুতঃ (ফলম্ + ইহ + অস্য) কুতঃ ফলমিহাস্য। ইহ = এখানে

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

৯. প্রাগুক্ত, ৭। ১৩, পৃ. ৫২২

১০. প্রাগুক্ত, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ৭১

১১. তত্রৈব, পৃ. ৭২

১২. 'লোক-কালচার'–– জোড়কলম শব্দ হিসাবে চলতে পারে। 'কালচার' শব্দতো আজকাল 'বাংলা'ই হয়ে গিয়েছে। তু. 'এদের কোন কালচার নেই' 'কালচার না থাকলে এই রকম ব্যবহার করবে' ইত্যাদি। হাজারে একজনও 'এদের কোন সংস্কৃতি নেই' এরকম বলেন না। 'লোক'-এর বাংলা 'ফোক' এখনও বাংলায় আসেনি। তাই 'লোকসংস্কৃতি (এই নিয়েও অনেক কথা হয়েছে .... যেমন 'লোকযান, ইত্যাদি) বোঝাতে 'লোক-কালচার' শিগ্‌গিরই চালু হয়ে যেতে পারে।

১৩. প্রাগুক্ত, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ৬৯

১৪. প্রাগুক্ত, তৃতীয় অঙ্ক, পৃ. ২১৫

১৫. তত্রৈব, পৃ. ২১৫

১৬. তত্রৈব, ৩ । ২৫, পৃ. ২৪২

১৭. . প্রাগুক্ত, ৬ । ২৫, পৃ. ৪৭৯

১৮. তত্রৈব, অধ্যাপনা, পৃ. ৪৮১

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩-৪৯০

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০ অঅ (pp. 410 ff বোঝাতে ব্যবহৃত

২১. প্রাগুক্ত, সপ্তম অঙ্ক, পৃ. ৪৮৯ অ

২২. চতূর্থ অংঙ্কের বিষ্কম্ভক, পৃ. ২৫০

২৩. তু. 'অস্মিন্ বেতসপরিক্ষিপ্তে লতামন্ডপে সিন্নিহিতয়া তয়া ভবিতব্যম্।
তথাহি ....
'অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারে হস্য পান্ডুসিকতে পদপঙ্‌ক্তির্দৃশ্যতে হভিনবা।।'
––প্রাগুক্ত, ৩।৫, পৃ. ১৮৫ (অনুবাদ : বেতসল তায় তৈরি এই কুঞ্জের কাছেই সে থাকতে পারে। কেননা––
এই লতামন্ডপের প্রবেশ পথে সাদা বালুর উপর নতুন পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। এই পায়ের ছাপগুলির সামনের দিকে হাল্কাভাবে ছাপ পড়েছে, কিন্তু নিতম্বের ভারে গোড়ালির দিকে গভীর ছাপ দেখা যাচ্ছে। (সুতরাং তা অবশ্যই শকুন্তলারই পদচিহ্ন হবে।)

২৪. পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলা-বর্ণিত দীর্ঘাপাঙ্গ নামক মৃগপোতকের (মৃগশাবকের) বৃত্তান্ত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

২৫. ষষ্ঠ অঙ্কে শ্যালের উক্তি : 'তস্‌স দংসণেন ভট্টিণো অভিমদো জানো সুমরাবিদো।' প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭

২৬. তত্রৈব, পৃ. ৪০২

২৭. এই কারণেই 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', নামকরণের ব্যাখ্যান্তর প্রয়োজন, যাতে কিনা 'আভরণ' ব্যাপারটাকেও জড়িয়ে দেওয়া যায়। অভিজ্ঞানঞ্চ ইদম্ আভরণঞ্চ অভিজ্ঞানাভরণম্ (কর্মধারয়)। অভিজ্ঞানাভরণম্ এব স্মৃতং (স্মরণম্) অভিজ্ঞানস্মৃতম্ (উত্তরপদলোপী কর্মধারয়)। অভিজ্ঞানস্মৃতম্ অস্যা অস্তি অভিজ্ঞানস্মৃতা (অর্শআদিভ্যো অচ্, স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্)। অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা অভিজ্ঞান-শকুন্তলা উত্তরপদলোপী কর্মধারয়)। অত্যঃপ নাটকের সঙ্গে অভেদোপচারে ক্লীবলিঙ্গ এবং 'হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' সূত্রে হ্রস্বত্বে অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

২৮. তু, 'এদং কিল মাদাপিদরো অপ্‌পাণং চ বজ্জিঅ অবরো ভূমিপড়িদং ণ গেণহদি। .... তদো তং সপ্‌গো ভবিঅং দংসদি।" .... সপ্তম অঙ্ক, পৃ. ৫৪২